মাননীয়
শ্রী বিশ্বনাথ পুরকাইত,
সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণপুর

আপনার ২৮ জানুয়ারী তারিখের চিঠির দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতামালা - সংক্রান্ত একটি লেখা পাঠালাম। আপনাদের বাৎসরিক উৎসব ও স্মরণিকা --উভয়ই সর্বাঙ্গসুন্দর হোক, এই কামনা করছি।

স্বামী বলভদ্রানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা -মালার ১২৫ বছর

-----স্বামী বলভদ্রনান্দ

তখনও ব্রিটিশ রাজত্বে সূর্য-অস্ত হয় না । তখনো বিশ্ব-জুড়ে ইংরেজদেরই দাপট । তবুও নতুন দেশ আমেরিকা স্পর্ধা দেখতে শুরু করেছে । তার অগ্রগতিও লক্ষ্য করার মতো । সেই আমেরিকা কলম্বাস-এর আমেরিকা আবিষ্কারের চারশো বছর পালন করতে চায় তাক লাগিয়ে দেয়ার মতো করে . ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সেই চারশো বছর পূর্ণ হচ্ছে । অনেক দিন আগে থেকেই আমেরিকার সরকার ভাবছে এর আগে লন্ডন, প্যারিস, ভিয়েনা প্রভৃতি জায়গায় যেসব বিশ্বমেলা হয়েছে কলম্বাস-এর আমেরিকা আবিষ্কারের ৪০০ বাঁচার-পূর্তি উপলক্ষ্যেও ওরকম একটা বিশ্বমেলা করতে হবে, কিন্তু আয়তনে, জাঁক-জমকে এবং লোকসামাগমে সেই বিশ্বমেলা আগের সব বিশ্বমেলাকে ছাপিয়ে যাব । ১৮৯০ ক্রীষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বেঞ্জামিন হ্যারিসন সেই ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রে সই করে অফিসিয়ালি জানালেন : শিকাগোর মিশিগান লেক বরাবর ১৮৯৩-এর ১লা মে থেকে অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে প্রস্তাবিত সেই কলম্বিয়ান প্রদর্শনী-মেলা , বা কলম্বিয়ান এক্সপোজিশন.

ঠিক হলো , সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হাতের সাহায্যে কিংবা , বিজ্ঞান, যন্ত্র ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে যত জিনিস আবিষ্কার করেছে , সে সব কিছুই দেখানো হবে এই প্রদর্শনী-মেলায় । তাই বাড়ীই তৈরী হলো ১৫০ টি --একেকটি বাড়ীতে প্রদর্শিত হবে একেক ধরনের জিনিস । যেমন , বিদ্যুতের জন্য একটি গোটা বাড়ী তৈরী হলো যেখানে বৈদ্যুতিক -আবিষ্কারের ফলে যত জিনিস উদ্ভাবিত হয়েছে সব সেই বাড়িতে দেখা যাবে । গোটা মেলার এলাকা দাঁড়ালো ১০৩৭ একর । দর্শনার্থীদের সুবিধের জন্য টয়লেট-ই তরী হলো ৩০০০ । সমস্ত মেলাটি দেখতে একজনকে ১৫০ মাইল হাঁটতে হতো এবং খুব তাড়াহুড়ো করে হলেও তিন সপ্তাহ অন্তত লাগত । কিন্তু এই প্রকান্ড মেলার সব বিভাগকে ছাপিয়ে শেষ পর্যন্ত সারা বিশ্বে সবচেয়ে আকর্ষণ,সবচেয়ে গুরুত্ব এবং সবচেয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল এই বিশ্বমেলারই একটি বিভাগ ---শিকাগো বিশ্বধর্মমহাসভা । এবং সেই ধর্মমহাসভার কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ । আমরা সেই কাহিনীর দিকেই এগুচ্ছি ।

কলম্বিয়ান এক্সপোজিশনের আলোচনা যখন চলছে তখনি একজন আইনজীবী প্রশ্ন তুললেন : শুধু "বস্তু"ই কি সভ্যতার মাপকাঠি ? " চিন্তা" নয় ? বরং চিন্তাই সমস্ত আবিষ্কারের নিয়ামক । কাজেই মানুষ মানসিক,বৌদ্ধিক ও মানবিক দিক দিয়ে যা অবদান রেখেছে তারও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এই মেলায় থাকুক না কেন ? ওই আইনজীবীর নাম চার্লস ক্যারল বনি । অনেকেই সমর্থন করলো বনি-কে এবং ঠিক হলো " কলম্বিয়ান এক্সপোজিশনের" অঙ্গ হিসেবে 20 টি বিশ্বসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে । যার একটি হবে ধর্ম-সম্মেলন । এটিই হবে পৃথিবীর প্রথম বিশ্ব-ধর্ম-সম্মেলন বা বিশ্বধর্মমহাসভা ।

এদিকে ধর্ম-মহাসভার প্রস্তুতি যখন চলছে, স্বামীজী তখন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর বেশে ভারতের গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । আত্মগোপন করার জন্য কখনো নাম নিচ্ছেন স্বামী বিবিদিষানন্দ , কখনো বা সচ্চিদানন্দ কিংবা বিবেকানন্দ । শেষে বিবেকানন্দ নামেই তিনি জগৎ-বিখ্যাত হন, কাজেই ওই নামটিই থেকে যায়। অনেকদিন পর্যন্ত সকলের এই ধারণা ছিল যে স্বামীজীর “বিবেকানন্দ” নামটি ক্ষেত্রীর রাজা অজিত সিংহ দিয়েছেন । পরবর্তীকালে দেখা গেছে ক্ষেত্রীর রাজার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই স্বামীজী 'বিবেকানন্দ' নামে একাধিক চিঠি লিখেছেন। কাজেই ওই নামটি ক্ষেত্রীর রাজার দেওয়া নয় ।

ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন যে, বিবেকানন্দ গড়ে উঠেছেন এই তিনটির সমবায়ে--গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ, শাস্ত্র বাং তাঁর মাতৃভূমি ভারতবর্ষ । শাস্ত্র পরে তিনি সনাতন সত্যকে জেনেছিলেন । কিন্তু সেই সত্য যে

আজকের দিনেও সত্য , তা তিনি বুঝলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন দেখে । তবুও বিবেকানন্দের নির্মাণ সম্পূর্ণ হলো না । গুরুর দেহত্যাগের পর সন্ন্যাস-গ্রহণ করে তিনি এবার ভারত-পরিক্রমায় বের হলেন । ধনী-দরিদ্র,পণ্ডিত-মূর্খ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, রাজা ও পথের ভিক্ষুক --সবার সঙ্গে মিশলেন । দেখলেন : শাস্ত্রে যে সনাতন সত্য আছে, তাঁর গুরুর জীবনে যে সত্যগুলো মূর্ত হয়ে উঠেছে , ভারতবর্ষের মানুষ যুগ-যুগ ধরে সমষ্টিগত ভাবে সেই সত্যগুলোকেই জীবনে ধরে রেখেছে. এই ভাবে বিবেকানন্দের উপলব্ধিতে যখন ভারতের সনাতন শাস্ত্র , শ্রীরামকৃষ্ণ এবং ভারতবর্ষ একাকার রূপে প্রতিভাত হলো , তখন-ই বিবেকানন্দের নির্মাণ সম্পূর্ণ হলো, তখনি বিবেকানন্দ সারা পৃথিবীর সামনে উপস্থিত হবার জন্য তৈরী হয়ে উঠলেন৷

এদিকে সারা পৃথিবী জুড়েই ১৮৯০ সাল্ থেকে শিকাগোয় যে ধর্মমহাসভা হতে যাচ্ছে তা নিয়ে অত্যন্ত আলোচনা হচ্ছে । ভারতবর্ষেও এই সংবাদ এসেছে, কারণ মাদ্রাজ-এর এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ধর্মমহাসভা উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের যেসব কমিটি তৈরী হয়েছিল তার একটির সভ্য ছিলেন.

স্বামীজীর কানে ধর্মমহাসভার সংবাদ প্রথম আসে ১৮৯১ এর শেষ ভাগে অথবা ১৮৯২-এর প্রথম দিকে । তিনি তখন ঘুরতে ঘুরতে পশ্চিম ভারতে এসেছেন ।নাম গোপন করলেও প্রতিভা গোপন করা কোনো জায়গাতেই সম্ভব হয়নি । সর্বত্রই মানুষ তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য , সাধুতা ও মহান চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বলতে থাকেন ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য । সকলের কাছে শুনতে শুনতে স্বামীজীর মনেও চিন্তাটা দানা বাঁধতে থাকে । ১৮৯২র জুন মাস নাগাদ তিনি যখন খান্ডোয়াতে, তখন হরিদাস চট্টোপাধ্যায় নামে এক উকিলকে তিনি বলেন : কেউ যদি যাতায়াতের খরচ দেয় , তবে তিনি শিকাগো যেতে প্রস্তুত । কিন্তু এ-সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে আরো কয়েক মাস লেগে যায় । ১৮৯২-র ডিসেম্বর মাসে তিনি দক্ষিণভারতে কন্যাকুমারীতে পৌঁছান । তারিখটি ছিল সম্ভবত ২৪ ডিসেম্বর । এপারে মা কুমারীর মন্দিরে প্রণাম করে তাঁর ইচ্ছা হলো সমুদ্রের মধ্যে যে- শিলাখণ্ডটিতে মা কুমারীর পদচিহ্ন আছে সেখানে যাবেন । নৌকোর মাঝি এক পয়সা ভাড়া চাইলো পার করে দেবার জন্য । স্বামীজীর কাছে এক পয়সাও ছিল না । স্বামীজী হাঙ্গরসঙ্কুল ওই সমুদ্র সাঁতরেই ওই শিলাখন্ডে পৌঁছালেন । তারপর ভারতভূমির দিকে মুখ ফিরে বসে গভীর ধ্যানে তিনদিন মগ্ন হয়ে রইলেন । ধ্যানের মধ্যে ভারতের গৌরবময় অতীত, বর্তমানের দুর্দশা ও তার কারণ এবং ভবিষ্যৎ ভারতের গৌরবময় রূপ ও সেই গৌরবময় ভবিষ্যতে পৌঁছনোর পথ --সব পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠলো তাঁর অন্তরে । তিনি বুঝলেন ভারতের প্রাণশক্তি রয়েছে ধর্মে । ভারতের অধঃপতন ধর্মের জন্য নয়, বরং ধর্মকে সমাজের প্রয়োজনে সঠিক ভাবে কাজে লাগানো হয়নি বলেই ভারতের পতন । এখন এমন ধর্ম চাই যার অন্যতম অঙ্গ হবে মানবপ্রেম ও কর্মশীলতা । এরই সঙ্গে সঙ্গে ভারত ও বিশ্বের কল্যানে তাঁর ভবিষ্যৎ ভূমিকা কী হবে তাও বুঝতে পারলেন তিনি ।

তিনি যে শিকাগোয় যাবেন সে সম্বন্ধে মনস্থির তিনি কন্যাকুমারীতেই প্রায় করে ফেলেছিলেন । তবুও তিনি আরো স্পষ্ট ভাবে ভগবানের নির্দেশ পেতে চাইলেন এবং একদিন অর্ধ-জাগ্রত অবস্থাতে সত্যিই তিনি সেই নির্দেশ পেলেন । তিনি দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সমুদ্র পার হয়ে যাচ্ছেন এবং তাঁকে ইঙ্গিত করছেন অনুসরণ করবার জন্য । তবুও কোথায় যেন একটু দ্বিধা : আমি নিজের খেয়ালেই বিদেশে যাচ্ছি না তো ? তখন তাঁর মনে পড়লো: শ্রীরামকৃষ্ণ মর্ত্যধামে নেই বটে, কিন্তু তাঁরই অংশস্বরূপিণী শ্রীমা সারদাদেবী তো এখনো স্থূলশরীরে আছেন । মা কে চিঠি দিলেন আশীর্বাদ চেয়ে । কিছু দিনের মধ্যেই মা আশীর্বাদ জানিয়ে পত্র দিলেন । বিবেকানন্দ তখন মাদ্রাজে ফিরে গেছেন । মায়ের পত্র পেয়ে তিনি

নিশ্চিত হলেন । আনন্দে সমুদ্রতীরে গিয়ে প্রায় নিত্য করলেন তিনি , বললেন: এখন আর কোনো কথা নেই--আমি এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত পাশ্চাত্য যেতে , কারণ স্বয়ং জগজ্জননীর আশীর্বাদ পেয়েছি ।

স্বামীজীর সিদ্ধান্তর কথা শুনে সাজো সাজো রব পরে গেলো আলাসিঙ্গা-প্রমুখ তাঁর মাদ্রাজের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে । তারা আক্ষরিক অর্থেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষা করে প্রায় চার হাজার টাকা তুলে ফেললো। এই টাকা অবশ্য খুব বেশী নয় আমেরিকা যাবার জন্য । স্বামীজীর এই শিষ্যরা এই টাকাতে আমেরিকা যাওয়ার জন্য একটা সেকেন্ড ক্লাস টিকেট মাত্র কাটতে পারলো। বাকী টাকা স্বামীজীর হাতে দিয়ে দিলো, অজানা বিদেশে পোঁছেই যদি স্বামীজীর কিছ লাগে সে জন্য। ক্ষেত্রীর রাজা অজিত সিং স্বামিজীর শিষ্য ছিলেন। তিনি স্বামীজীর টিকেটটা কে ফার্স্ট ক্লাস টিকেট করে দিলেন ও স্বামীজীর জন্য একটি সিল্কের গেরুয়া পোশাক তৈরী করিয়ে দিলেন। স্বামীজী মুম্বাই থেকে যাত্রা করলেন ৩১ মে ১৮৯৩ তারিখে। পথে জাপানে আরেকটা জাহাজে উঠলেন। স্বামীজিকে কেউ শীতের পোশাক কিনে দেয়নি , তাই প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় স্বামীজী শীতে প্রায় মারা যাচ্ছিলেন---জাহাজের ক্যাপ্টেন শীতবস্ত্র দিয়ে তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন।

২৫ মে ১৮৯৩ তারিখে স্বামীজী কানাডার ভ্যাঙ্কুভার-এ এসে পৌঁছান । সেখান থেকে দীর্ঘ(প্রায় ১৮০০ মাইল)ট্রেন যাত্রার পর স্বামীজী ৩০ জুলাই ১৮৯৩ শিকাগোয় এসে পৌঁছালেন।

শিকাগোয় পৌঁছেই স্বামীজী কয়েকটি মন্দ খবর পেলেন--প্রথমত ধর্মামসভায় যোগদানের শেষ তারিখ পেরিয়ে গেছে। তাছাড়া, তারিখ থাকলেও হয়তো তিনি যোগ দিতে পারতেন না , কারণ তিনি সঙ্গে করে কোনো পরিচয় -পত্র আনেননি যা প্রমাণ করতে পারে, সত্যি তিনি ভারতবর্ষ থেকে আগত একজন যোগ্য ব্যক্তি যিনি ধর্মমহাসভায় কোনো একটি ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম। তাঁর শিষ্যরা ভেবেছিলেন,তাঁরা যেমন কোনো পরিচয় -পত্র ছাড়াই বিবেকানন্দকে চিনে নিয়েছিলেন, তেমনি শিকাগোর মানুষও তাঁকে সেভাবেই চিনে নেবেন--শুধু তিনি সেখানে পৌঁছতে পারলেই হলো। এতই তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন তাঁদের গুরুর (অর্থাৎ স্বামীজীর) অনন্য যোগ্যতা সম্বন্ধে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁরা যেমন ভেবেছিলেন তাই হয়েছিল , কিন্তু তার জন্য একটু বিলম্ব হয়েছিল ও স্বামীজিকে কিছুটা ভুগতে হয়েছিল । তাছাড়া স্বামীজী আগে জানতেন না যে ধর্মমহাসভা শুরু হবে আরো ৪১ দিন পর ১১ সেপ্টেম্বর। আলাসিঙ্গারা স্বামীজিকে প্রায় ২০০০ টাকার মতো দিয়েছিলেন। হোটেলে প্রতিদিন ১০০ টাকার মতো খরচ। অর্থাৎ যা টাকা তাঁর কাছে আছে তাতে 20 দিনের বেশি তার চলবে না । কি করা যায় ? কানাডা থেকে শিকাগো আসার পথে এক মাঝবয়েসী মহিলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, স্বামীজীর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে তিনি বলেছিলেন যে স্বামীজী কোনোদিন বোস্টন এ গেলে যেন তাঁর অতিথি হন। স্বামীজীর এখন সেই কথা মনে পড়লো। তিনি এও শুনেছিলেন যে বোস্টন অপেক্ষাকৃত সস্তা জায়গা । তাই তিনি বোস্টন চলে গেলেন।

মিস ক্যাথেরিন স্যানবর্ন-এর বাড়ী থেকে স্বামীজী কিছুদিন পরে তাঁর এক শিষ্যকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন : এখানে থাকায় আমার এই সুবিধে হয়েছে যে আমার প্রতিদিন যে এক পাউন্ড করে খরচ হচ্ছিলো সেটা বেঁচে যাচ্ছে, আর তাঁর লাভ এই যে , তিনি তাঁর বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে ভারতবর্ষের এক অদ্ভুত জীব দেখাচ্ছেন. কিন্তু মিস স্যানবর্ণ তাঁকে বোস্টন ও আশেপাশের বিভিন্ন ক্লাব গির্জা ও সভায় বক্তৃতা করতে নিয়ে যেতে থাকলেন। বোস্টনের শিক্ষিত সমাজে স্বামীজী সুপরিচিত হয়ে উঠলেন এবং এই ভাবেই একদিন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের " বিশ্বকোষতুল্য জ্ঞানের অধিকারী " বলে কথিত অধ্যাপক জন হেনরি রাইট-এর সঙ্গে। স্বামীজীর কাছে ধর্মমহাসভায় যোগদেওয়ার জন্য কোনো পরিচয়পত্র নেই শুনে তিনি বলেছিলেন : " আপনার কাছে পরিচয়পত্র চাওয়ার অর্থ হচ্ছে সূর্যকে প্রশ্ন করা তাঁর কিরণ দেয়ার কোনো অধিকার আছে কিনা " । তাঁর মনে হয়েছে , সূর্যের মতোই স্বামীজী স্বয়ংপ্রকাশ । তারপর

তিনি নিজেই ধর্মমহাসভার উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে একটি পরিচয়পত্র লিখে দিলেন : " ইনি এমন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি যে আমেরিকার সমস্ত অধ্যাপকের পান্ডিত্যকে এক করলেও এর পান্ডিত্যের সমান হবে না.

তিন সপ্তাহ বোস্টনে কাটিয়ে তিনি ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ আবার শিকাগো রওয়ানা হলেন। আর মাত্র তিন দিন পর ধর্মসভা। এই তিন সপ্তাহে বোস্টন ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্বামীজী বারোটা বক্তৃতা করেছিলেন৷ ৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় স্বামীজী আবার শিকাগোয় এসে পৌঁছলেন। কিন্তু ধর্মমহাসভার ঠিকানা লেখা কাগজ টা তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই সেই রাতটা তিনি ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে আশ্রয় নিলেন স্টেশন-এই একটি মালগাড়ির ফাঁকা কামরায়।

পরদিন ঘুম ভাঙলো লেক মিশিগানের মিষ্টি হাওয়ায় আর প্রচন্ড খিদেয় । কয়েকঘন্টা শিকাগোর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলেন : যদি কেউ ধর্মমহাসভার অফিসার ঠিকানাটা বলে দিতে পারে আর ভারতবর্ষের মতো এখানেও যদি কেউ ভিক্ষে চাইলে ভিক্ষে দেয়! দুটির কোনোটিই হল না । অবশেষে শরীর ও মনে প্রচণ্ড অবসন্ন হয়ে রাস্তার পাশে বসে পড়লেন । ঠিক করলেন : আর চেষ্টা করবেন না তিনি ; ভগবানের নির্দেশ নিয়ে এদেশে এসেছেন, ভগবানই দেখুন তাঁকে । আর ভগবানও যেন এই মুহূর্তটির জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। রাস্তার ওপারের বাড়িটি থেকে একজন অভিজাত মহিলা বেরিয়ে এলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি কিনা. স্বামীজী উত্তর দিলে তিনি তাঁকে সাদরে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন, সযত্নে তাঁর খাওয়ার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন, শেষে নিজেই তাঁকে ধর্মমহাসভার চেয়ারম্যান রেভারেন্ড বারোজ -এর কাছে নিয়ে গেলেন। সেখানে স্বামীজী হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হয়ে নাম নথিভুক্ত করলেন। ধর্মমহাসভা শুরু হতে তখন চব্বিশ ঘন্টাও বাকী নেই।

ধর্মমহাসভার অনুষ্ঠান হবে বিখ্যাত " আর্ট ইনস্টিটিউট অফ শিকাগো"-র কলম্বাস হলে যার আসনসংখ্যা ৪,০০০ । স্বামীজী ১০ সেপ্টেম্বর রাতটা সম্ভবত " আর্ট ইনস্টিটিউট-" -এর কাছেই মিস্টার লায়ন এর বাড়িতে কাটিয়েছিলেন। তাঁদের বাড়িতে ধর্মমহাসভার আরো প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁরা সকলেই শেতাঙ্গ । কাজেই ভারতবর্ষের একজন প্রতিনিধি শেতাঙ্গদের মধ্যে থাকলে যদি শেতাঙ্গ প্রতিনিধিরা অপমানিত বোধ করেন ? এইরকম আশঙ্কা করে লায়ন দম্পতি প্রথমে ভেবেছিলেন : সেরকম হলে ভারতীয় প্রতিনিধিটির জন্য দু-এক দিন পরে তাঁরা অন্যত্র থাকবার ব্যবস্থা করে দেবেন। সেদিন স্বামীজী লায়ন-দের বাড়িতে যখন পৌঁছালেন তখন রাত হয়েছে, মিস্টার লায়ন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পরদিন সকাল বেলা স্বামীজিকে দেখলেন বাড়ির লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ছেন। মিস্টার লায়ন সৌজন্যবশতঃতাঁর কাছে গিয়ে কিছুক্ষন কথা বললেন। তারপরেই মিসেস লায়ন কে গিয়ে বললেন : কালকে আমরা যা ঠিক করেছিলাম পাল্টে নিচ্ছি। এই ভারতীয় প্রতিনিধিটির মতো মানুষ আমি আগে কখনো দেখিনি। ইনি যতদিন ইচ্ছা আমাদের মধ্যে থাকবেন, তার জন্য যদি অন্য শেতাঙ্গ প্রতিনিধিরা চলেও যায় তাতেও ক্ষতি নেই।

পরদিন, ১১ সেপ্টেম্বর ঠিক ১০টার সময় কলম্বাস হল –এ সমবেত ১০ টি ধর্মের উদ্দেশ্যে ১০ টি ঘন্টাধ্বনির মাধ্যমে ধর্মমহাসভার উদ্বোধন হলো । সেই ১০ টি ধর্ম হলো : ইহুদি ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, তাও ধর্ম, কনফুসিয়াসের ধর্ম, শিন্টো ধর্ম, ক্যাথলিক ধর্ম , পারসিক ধর্ম, এবং গ্রিক চার্চ ও প্রটেস্টান্ট ধর্ম । সভাকক্ষে উপস্থিত ৪,০০০ সুশিক্ষিত নরনারী । বক্তারা সবাই বহু আগে থেকে ধর্মমহাসভার জন্য প্রস্তুত হতে পেরেছেন, তাঁরা সবাই একের পর বক্তৃতা করে যাচ্ছেন; কিন্তু স্বামীজী তৈরী হবার সময়ই পাননি, কারণ মাত্র কয়েকঘন্টা আগেও তাঁর যোগদান করাটাই অনিশ্চিত ছিল । তাই প্রথম অধিবেশনে বলতে তিনি সাহস পেলেন না৷ দ্বিতীয় অধিবেশনে চারজনের বক্তৃতা হয়ে যাবার পর তিনি বক্তৃতা দিতে উঠলেন । সমবেত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে তিনি সম্বোধন করলেন : "সিস্টার্স এন্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা " ! সঙ্গে সঙ্গে চার হাজার নরনারী উঠে দাঁড়িয়ে দু-মিনিট ধরে হাততালি দিতে লাগলো । আসলে স্বামীজীর ওই সম্বোধনের মধ্যে এমন আপন-করা ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছিলো যে সবাই উদ্বেল হয়ে উঠেছিল । তারপর স্বামীজী মিনিট পাঁচেকের একটি ছোট্ট ভাষণ দেন । ছোট হলেও ভাষণটি তার ভাবের দিক থেকে অন্যসকলের ভাষণের থেকে আলাদা । সবাই বলে

গেলেন নিজের নিজের ধর্মের মহিমার কথা । স্বামীজী বললেন সব ধর্মই যে সত্য সেই কথা---যা একই সঙ্গে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ,হিন্দুধর্ম এবং ভারতবর্ষের সাধারণ বাণী । স্বামীজী বললেন:"আমরা শুধু সবধর্মকে সহ্যই করি না, সব ধর্মকেই আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি । ... সাম্প্রদায়িকতা ,গোঁড়ামি এবং তার ভয়াবহ ফলশ্রুতি ধর্মোন্মাত্ততা বহুদিন ধরে এই সুন্দর পৃথিবীকে গ্রাস করে রেখেছে, মানুষের রক্তে পৃথিবীকে বার বার সিক্ত করেছে. ...এই সব ভয়ঙ্কর পিশাচ যদি না থাকতো , তাহলে মানবসমাজ এখনকার থেকে অনেকবেশী উন্নত হতো.... কিন্তু তাঁদের অন্তিম সময় উপস্থিত ; এবং আমি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করি , এই সম্মেলনের সম্মানে আজ সকালে যে ঘন্টাধ্বনি হলো তা যেন সমস্ত ধর্মোন্মাত্ততা , তরবারি অথবা লেখনীর সাহায্যে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার অত্যাচারের মৃত্যুঘন্টা হয়. "

বক্তৃতা শেষ হবার পরে আবার কয়েক মিনিট ধরে করতালি এবং অধিবেশন শেষ হয়ে যাবার পর শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রত্যেকের স্বামীজীর কাছে এসে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করার জন্য ব্যাকুলতা ---এরপর ধর্মমহাসভার বাকী দিনগুলোতে যখনই স্বামীজী বক্তৃতা করেছেন, এটি-ই হয়ে উঠলো স্বাভাবিক দৃশ্য । প্রথম দিনের এই বক্তৃতার পর শিকাগোর রাস্তায় রাস্তায় শোভা পেতে থাকে তাঁর ছবি । তাঁকে দেখলেই লোকে হর্ষধ্বনি করে উঠতো । বক্তৃতা না করে শুধুমাত্র মঞ্চের এক পাশ থেকে আরেক পাশে হেঁটে গেলেই লোকে হাততালি দিয়ে উঠতো এবং বালকের মতো সরল হাসিমাখা মুখে তিনি হাজার লোকের সেই স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছাসের উত্তর দিতেন .

ধর্মমহাসভা চলেছিল মোট ১৭ দিন ----১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ । এই সতেরোদিনে তিনি অন্তত ১২ টি বক্তৃতা করেছেন । সঠিক সংখ্যা জানার উপায় নেই, কারণ ধর্মমহাসভার বক্তাদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন বলে অনেকসময় তাঁকে উদ্যোক্তাদের অনুরোধে অনুষ্ঠান-সূচিতে নাম না থাকলেও অধিবেশনের শেষ বক্তা হিসেবে বক্তৃতা করতে হয়েছে---সভাকক্ষে লোক ধরে রাখবার জন্য । শুধু ঘোষণা করলেই হতো: আপনারা যাবেন না, অধিবেশনের শেষে বিবেকানন্দ কিছু বলবেন । তাঁর পাঁচ মিনিটের ভাষণ শোনার জন্য শ্রোতারা তখন অন্য বক্তাদের নীরস দীর্ঘ বক্তৃতাও ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে শুনত । সংবাদপত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে আমরা এগুলি জানতে পারি ।

স্বামীজী শিকাগো ধর্মমহাসভায় যে কয়টি বক্তৃতা দিয়েছেন তাঁর মধ্যে স্বামীজীর বাণী ও রচনায় মাত্র ছটি বক্তৃতার পূর্ণ বাণীরূপ পাওয়া যায় । তার মধ্যে তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য. ১১ সেপ্টেম্বর-এর ভাষণ, ১৯ সেপ্টেম্বর-এর ভাষণ এবং ২৭ সেপ্টেম্বর শেষ অধিবেশনের ভাষণ. এর মধ্যে ১৯ সেপ্টেম্বর এর "হিন্দুধর্ম" ভাষণটি স্বামীজীর প্রধান ভাষণ , কারণ ধর্মামসভায় স্বামীজী হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়েছিলেন । এই ভাষণটি দীর্ঘ লিখিত ভাষণ। নিবেদিতা এই ভাষণটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন । তিনি বলেছেন : ভবিষ্যতের হিন্দুমাতা যখন তাঁর সন্তানদের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে পরিচিত করতে চাইবেন, তখন তাঁকে অবশ্যই এই ভাষণটির দ্বারস্থ হতে হবে । এই ভাষণটির মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রকৃত রূপ ফুটে উঠেছে ।

এই বক্তৃতাটিতে তিনি হিন্দুধর্মের কোনো একটি বা কয়েকটি শাখার কথা বলেননি, হিন্দুদের সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যস্থিত সাধারণ সত্যগুলির কথা বলেছেন । হিন্দুধর্ম যে সব ধর্মকে, সব ধর্মমতকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, সে কথাও বলেছেন , এবং ভাষণটি হিন্দুধর্মের উপরে হলেও ভাষণটি শেষ করেছেন একটি বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শকে শেষ লক্ষ্য হিসেবে উপস্থিত করে । তিনি বলতে চেয়েছেন : হিন্দু হই বা যে-ধর্মাবলম্বীই হই, আমাদের অবশ্যই স্বধর্ম -নিষ্ঠ হয়ে চলতে হবে , এবং আমাদের ধর্মজীবনের যাত্রা শেষ করতে হবে বিশ্বজনীন ধর্মের খোলা প্রান্তরে উপনীত হয়ে ।

শেষ দিন ২৭ সেপ্টেম্বর স্বামীজী আবার বাগ্মিতার উত্তুঙ্গ শিখরে উঠে গেলেন, বললেন : " খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না, কিংবা হিন্দু বা বৌদ্ধকেও খ্রিষ্টান হতে হবে না । কিন্তু প্রত্যেকেই অন্যধর্মের ভাবগুলিকে আত্মস্থ করবে এবং নিজের নিজের বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী অগ্রসর হবে । যদি এই ধর্মমহাসভা জগতে কোনো কিছু প্রমান করে থাকে তা হলো এই : সাধুতা, পবিত্রতা ও দয়া-দাক্ষিণ্য জগতের কোনো একটি বিশেষ ধর্মমণ্ডলীর একচেটিয়া সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক ধর্মপদ্ধতির মধ্যেই অতি উন্নত চরিত্রের নরনারী জন্মগ্রহন করেছেন । এইসব প্রত্যক্ষ প্রমান সত্ত্বেও যদি কেউ এরকম স্বপ্ন দেখেন যে , অন্যান্য ধর্ম লোপ পাবে আর তাঁর ধর্মই শুধু টিকে থাকবে তবে তিনি বাস্তবিকই কৃপার পাত্র। ....তাঁর মতো মানুষের বিরোধিতা সত্ত্বেও শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপরে লিখিত হবে : " বিবাদ নয়, সহায়তা ; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহন; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।"

"আকাশের মতো উদার , সমুদ্রের মতো গভীর"---স্বামীজীর বাণী সম্বন্ধে এই কথা পাশ্চাত্যের মানুষ বলতে লাগলো । বলতে লাগলো : ওদের দেশে আমরা ধর্মপ্রচারক পাঠাই ? ওদের-ই উচিত আমাদের দেশে ধর্ম-প্রচারক পাঠানো ।

বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের অসংখ্য প্রশস্তি-বাক্যের মধ্যে দুটি এখানে উল্লেখ করছি প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা হিসেবে। প্রথমটি হচ্ছে ধর্মমহাসভার বিজ্ঞানশাখার সভাপতি মিস্টার মারউইন মেরী স্নেলের একটি দীর্ঘ পত্রের আংশিক বঙ্গানুবাদ। এই পত্রটি তিনি লিখেছিলেন ধর্মমহাসভা হয়ে যাবার চার মাস পর ৩০ জানুয়ারী ১৮৯৪ তারিখে ভারতীয় পত্রিকা 'হোপ" কে । এই চিঠিটি-ই পরে 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা ৯ই মার্চ ১৮৯৪ তারিখে পুনর্মুদ্রণ করেছিল । মিস্টার স্নেল লিখছেন : " বিশ্বধর্মমহাসভা ... খ্রিষ্টান-জগৎকে , বিশেষতঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে এই শিক্ষাই দিয়েছে যে...আরো কিছু ধর্ম আছে, যেগুলি খ্রিষ্টধর্মের চেয়ে বেশী শ্রদ্ধেয়। (এবং সেই ধর্মগুলির মধ্যে) হিন্দুধর্মের মতো আর কোনো ধর্মই ধর্ম-সম্মেলন বা আমেরিকার মানুষের উপর এতটা গভীর প্রভাব ফেলতে পারেনি যেমনটি করেছে হিন্দুধর্ম । ...(এবং) অবিসংবাদিতরূপে হিন্দুধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিরূপে প্রতিভাত হয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ । নিঃসন্দেহে তিনিই ধর্মমহাসভার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি বার বার ভাষণ দিয়েছেন --- ধর্মমহাসভার মূল শাখা ও বিজ্ঞানশাখা দু-জায়গাতেই । বিজ্ঞানশাখায় তিনি যে-বক্তৃতাগুলি দিয়েছেন, আমার সৌভাগ্য হয়েছে সেগুলির সভাপতিত্ব করার। প্রতিটি ক্ষেত্রেই খ্রীষ্টান বা অ-খ্রীষ্টান অন্য যে-কোনো বক্তার চেয়ে তাঁকেই শ্রোতারা অধিকতর আগ্রহে গ্রহণ করেছে...যেখানেই তিনি যেতেন লোকে তাঁকে ছেঁকে ধরত এবং তাঁর প্রতিটি কথা আগ্রহের সঙ্গে শুনতো ।"

আরেকজনের উদ্ধৃতি দেব, তাঁর নাম অনাগরিক ধর্মপাল । তিনি কলকাতার মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা । ধর্মপাল ধর্মমহাসভায় বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে স্বামীজীর সঙ্গে একই অধিবেশনে ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি ধর্মমহাসভার পরেই ভারতে ফিরে এসেছিলেন এবং ১৪ মে ১৮৯৪ তারিখে কলকাতার মিনার্ভা থিয়েটারে ধর্মমহাসভা বিষয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন । কলকাতার মানুষ তাঁর মুখে শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের কীর্তিগাথা এই প্রথম প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণরূপে শুনে শিহরিত হয়েছিল। ধর্মপাল বলেছিলেন : " আমি কোনো দ্বিধা না রেখেই বলতে পারি যে হিন্দুসন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মতো আর কেউই ধর্মমহাসভায় অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি। ... যখনি স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতার কথা ঘোষণা করা হতো, মানুষ ছুটতো আসন-গ্রহণের জন্য । স্বামী বিবেকানন্দের ছবি

শিকাগোর রাস্তায় রাস্তায় প্ল্যাকার্ড করে ঝোলানো থাকতো । ...যেখানেই তিনি যেতেন, লোকে তাঁকে ঘিরে ধরত এবং তিনি যা কিছু বলতেন, তাই গভীর আগ্রহের সঙ্গে লোকে শুনত ।"

স্বামীজীর শিকাগো-বক্তৃতার সাফল্যের খবর যখন ভারতবর্ষে এসে পৌঁছলো , ফল হলো বৈদ্যুতিক । সেই হীনম্মন্যতার যুগে সাদা চামড়ার মানুষগুলিকেই ভারতবর্ষ সব বিষয়ে গুরু বলে মনে করতো । সেই সাদা চামড়ার দেশের মানুষজনই আমাদের দেশের এক সন্ন্যাসীকে মাথায় তুলে নিয়েছে--- এই "অলৌকিক" সংবাদ যখন দেশবাসী জানল , তখন এক লহমায় গোটা জাতির অন্তরাত্মায় সিংহবলের সঞ্চার হলো, দেশ জেগে উঠলো৷

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন : স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য যাত্রা হচ্ছে প্রথম সুস্পষ্ট লক্ষণ যে ভারতবর্ষ জেগে উঠেছে. এবং সে জেগে উঠেছে শুধু নিজে বেঁচে থাকার জন্য নয়, জয় করবার জন্যও । এই জয় অবশ্যই গোলা-বারুদ-অস্ত্রের সাহায্যে নয়---ভারতের ভাবসম্পদের শক্তিতে ।

কলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকা ১৮৯৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে লিখেছিলো : “He (Swamiji) has done much more to elevate our nation in the estimation of the West than what has hitherto been done by all our political leaders put together”. ---সমস্ত রাজনৈতিক নেতারা একযোগে যে-মর্যাদা দেশকে দিতে পারেননি, তিনি একা সেই মর্যাদাপ্রাপ্তিকে দেশের জন্য সম্ভব করে তুলেছেন ।

যথার্থই বলেছেন চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীজী : "আমাদের সাম্প্রতিক অতীতের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমরা কত ঋণী । ভারতের আত্মমহিমার দিকে ভারতের নয়ন তিনি উন্মীলন করে দিয়েছেন । আমরা অন্ধ ছিলাম, তিনি আমাদের দৃষ্টি দিয়েছেন৷ তিনি না থাকলে আমরা আমাদের ধর্ম হারাতাম, স্বাধীনতাও লাভ করতে পারতাম না৷ আমাদের সব কিছুর জন্য আমরা তাই তাঁর কাছে ঋণী । তিনি আমাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার পিতা । "

জাতিগতভাবে সেই আত্ম-আবিস্কারের, আত্ম-মহিমা-অবলোকনের-ই ১২৫তম বর্ষ আমরা পালন করছি স্বামীজীর শিকাগো - বক্তৃতামালার ১২৫ তম বর্ষ পালনের মধ্যে দিয়ে ।